KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নীতিশিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব)

—*—

কোনো ব্যক্তির জন্মমুহূর্ত্তে বৃহস্পতিগ্রহ আকাশের কোনো এক বিশেষ জায়গায় ছিলেন বলিয়া সে ব্যক্তি জজসাহেব হইলেন, আর এবৎসর শনৈশ্চর কোন্ রন্ধ্র-পথে বিশেষ কোনও স্থানে প্রবেশ করিলেন বলিয়া, বনপথে-পথে কাব্যচর্চ্চা করিবার কালে অকস্মাৎ পুঞ্জ পুঞ্জ ভীমরুলের হুল খাইয়া আর এক ব্যক্তি শয্যাগত হইয়া গেল, কার্য্য এবং কারণের এত বিষম দূরত্বকেও যাঁদের মন আশ্চর্য্য ডিগ্‌বাজি-বলে কুমারিকা ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী জলপ্রণালীর মতো অনায়াসেই ডিঙাইয়া যায়—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক্ তাঁদেরই পক্ষেই এই সত্যটিকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া কঠিন যে, সমুদয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার গোড়ায় আছে আধ্যাত্মিক সমস্যা। অথচ পথে ঘাটে স্নানে পানে গল্পে ও গুজবে সাহিত্যে ও সমালোচনায়—কোথাও ধর্ম্মের কাহিনীর আর অন্ত নাই এবং মৃদঙ্গের বোলে রাত্রে ঘুমান দায়। ধর্ম্মেরই নাম করিয়া পেটেল-বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হইতেছে, অথচ বিবাহ নাকি দুইটি অমর আত্মার অবিনশ্বর যোগ, আর আত্মা নাকি "নৈনং-ছিন্দন্তি-শস্ত্রানি" ইত্যাদি, এবং বিকাররহিত, এবং লিঙ্গ এবং জাতি-বিবর্জ্জিত। ধর্ম্মের কথা এখানে এত বেশি যে, ধর্ম্ম

এখানে কথার কথা। তাই এখানে যদি এই কথাটি বলা যায় যে, ঘটনা শুধুই ঘটনামাত্র নয়, প্রতিদিনের তুচ্ছতম ঘটনাও আধ্যাত্মিক ঘটনা, তাহা হইলে এই বিপদ হইবে যে, "তত্ত্বমসি," "সচ্চিদানন্দ" প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই-বিরাজিত অসংখ্য বুলির সঙ্গে আর একটি বাঙলা বুলি মাত্র যোগ করা হইবে—যা কারো মনের উপরে তিলমাত্র দাগ কাটিবে না। "Every man, I am with thee, and shall be with thee even unto the end of the world"—এই আশ্বাসবাণী যাদের জপের মন্ত্র, তারাই যে কেবল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দৃষ্টিগোচর করিবার মতো অকাজে বরফের তলে বেহুদা প্রাণ খরচ করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশীয় "আধ্যাত্মিক"-দের জানা না থাকিলেও, রেলে ইষ্টিমারে এবং কাছারীতে উক্ত জীবদের প্রাণের বেগের ধাক্কা নিতান্তই জাজ্বল্য-রূপে তাঁদের গোচরীভূত না হইয়া যায় না। অথচ তাঁদেরই ঐ "তত্ত্বমসি", "I am with thee"-রও এক কাঠা উপরে, তথাপি একটি হচ্ছে উত্তেজক মাদক, আর একটি অবসাদক আফিং। "সোঽহং" যে ঐজাতীয় উদ্‌ভিদ্‌-বিশেষের ধূম্রের সঙ্গে কি প্রকার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িত তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কোনো মেলায় যাইবার আয়াস-স্বীকার অনাবশ্যক। এদেশে জীবন যদি চিন্তাকে তালাক না দিত, তবে এ প্রকার অঘটন ঘটিত না। ন্যায়-দর্শনের কচ্‌কচিরও অন্ত নাই, অথচ "রামবাবু একজন সাধু উকিল" ইত্যাকার বিরোধাভাসও—ইংরাজিতে যাকে বলে Contradiction in terms—অহরহ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবে। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—যোগস্থ হইয়া আর যাই করা যাক্‌, আদালতে কাজ করা চলে না, কেন না মামলাবাজি রাজযোগ নয়।

জীবনের সঙ্গে চিন্তার এই যে বিচ্ছেদ, এ হচ্ছে একটা বাতব্যাধি, যা একেবারে অসাড় করিয়া রাখিয়াছে এই জাতের will-কে। স্নায়ু-মণ্ডলী মস্তিষ্কের বার্ত্তাকে হস্তপদের পেশীর কাছে বহন করিতে নারাজ—দর্শনের সিদ্ধান্ত দর্শনেরই সিদ্ধান্ত—জীবনের ক্ষেত্রে তার কোনো কর্ষণ নাই, তার সমুদয় আকর্ষণই নিছক intellectual. তাই যে জাত পৃথিবীর সকল সম্পদকে "যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌" বলিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যেমন হাসিয়া তার কাঠের পুতুলকে ছোট ভাইয়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলে, তেমনি করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল,—সমস্ত উপকরণ-জালকে ছিন্ন করিয়া বিচিত্রের মধ্যে এককে আবিষ্কার করিবার হৃদয়-ভরা মহানন্দে,—সেই জাত শেষকালে বসন্তরোগের আক্রমণের মহাভয়ে গর্দ্দভ-বাহিনীর কাছে পাঁঠা বলি দিল; একই ব্যক্তি মহোৎসাহে একই সময়ে অদ্বৈতবাদ ও জাতিভেদের স্তুতিগানে মাতোয়ারা!

"Moral Faculty" হইতেছে কর্ম্মের সেই প্রেরণা, যা যুগ হইতে যুগান্তরে জাতিদের লইয়া যায় খাদ কাটিয়া কাটিয়া, যার প্রসাদে দেশ দেশান্তর ফুলে ফলে হাসিয়া ওঠে, যে জাতির মধ্যে তাহা মরিয়া গেল, সে জাতি জগৎ-জোড়া এই দৌড়-খেলায় হঠাৎ থামিয়া গেল। কর্ম্ম-চেতনার এই atrophy, আর আমাদের দেশব্যাপী এই পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ কিংবা আমাদের দুর্গতির আর যে-কোন-এক বিভাগই ধরা যাক্‌—এ দুইয়ের মধ্যে যথাক্রমে কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধের আরোপ, এ হইতেছে এমন একটি লম্ফ, যা ত্রেতাবতারের বন্ধুবরেরও ঈর্ষা-উৎপাদক, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য।

(২)

আজ সকলেই সকলকে বলিতেছেন, "প্রতীকার শ্চিন্ত্যতাং তাবৎ" অথচ কোথা হইতে যাত্রা সুরু করিতে হইবে, নানা হট্টগোলে তা'র ঠাহর পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের নাই সেই প্রতিভার তেজ, যা বস্তুপুঞ্জকে গলাইয়া এক নিমেষে স্বচ্ছ করিয়া লয়, সেই খরধার বুদ্ধি, যা কঠিন প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারে, সেই মনীষা, যা এক ডুবে সমুদয় ব্যাপারের তলদেশে গিয়া পৌঁছায়। আমরা হুতাশে ছুটা-ছুটি করি, আমাদের হাতে সবই হইতেছে জোড়াতাড়া, কেননা কোন সমস্যার মূল আমরা খুঁজিয়া পাই না। শত শতাব্দী ব্যাপিয়া জীবন হইতে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া এই লাভ করিয়াছি যে, না পারি সে কোথায় তাহা বলিতে, না পারি তাকে চিনিতে, যদি বা কোনো শুভ লগ্নে সে দেখা দেয়। রাজনৈতিক ভ্রাতৃদ্বয়, রাম ও শ্যামের, জীবনের মধ্যে আর যাই থাক, সত্য ছিল না। সত্য অতি অভিমানী, এতটুকু অনাদর সে সহিতে পারে না। আমাদের জীবন হইতে সত্য পলায়ন করিয়াছে, তাই আজ আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ। নিজেরই তৈরি দেয়ালে নিজেকে ঘেরিয়াছি, সেই দেয়ালই বাহিরে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল দিক হইতে আমাদিগকে ঠেকাইতেছে, সেই দেয়ালকে কটুকাটব্য বলিলে সে একচুল নড়িতেছে না, মাঝে হইতে Cervantes-এর সেই নভেলের নায়কের অভিনয় হইতেছে।

(৩)

আমরা কিনা "অল্প লইয়া থাকি", অন্ত-ই হইতেছে আমাদের কারবারের মূলধন, তাই অন্ত-র উল্টা করিয়া আমরা অনন্তকে লাভ

করিতে চাই। অথচ অনন্তই যে সত্য, সেই যে আমাদের সমস্ত ভাবনার মূল আশ্রয়। যা মিথ্যা নয় তাই আমাদের কাছে সত্য। সত্য কিন্তু আসলে নিজেতে নিজে প্রতিষ্ঠিত, স্বরাট্; সে আলো; মিথ্যা তার অবরোধ, ছায়া। আমাদের দেশ "নেতি"-র দেশ। Nay nay করিতে করিতে "yea"-তে পৌঁছিবার চেষ্টা আমাদের অভ্যাসগত, "শুদ্ধম্" আমাদের কাছে "অপাপবিদ্ধম্।" শুদ্ধ সত্য এই কারণে আমাদের কাছে কেবলমাত্র দার্শনিক তত্ত্ব—তিনি হচ্ছেন "তৎ সৎ"। সেইজন্য নীতি আমাদের কাছে এমন একটা খাল, যা কাটা হইয়াছে কিন্তু তার মধ্যে জলের প্রবাহ ছোটে নাই। "Holy Holy" করিয়া য়ীহুদী প্রফেটের চোখে জল কেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। তত্ত্ব আমাদের জীবন হইতে ঐ কারণেই বিচ্ছিন্ন—মনের আবেগ তত্ত্ব এবং জীবনের মধ্যে সেতু—অথচ আমাদের দার্শনিক আলোচনায় মনের আবেগের স্থান নাই। আমাদের সমুদয় ভাবোচ্ছ্বাস তাই স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চেরই মধ্যে নিষ্ফলীভূত। প্রবল ভাবাবেগ—যার কথা ছিল কর্ম্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার, সে ক্রমে গড়গড়া হইতে গড়াগড়িতে বিবর্ত্তিত হইয়া শয্যাকেই সুখকর করিয়া তুলিল।

(৪)

ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক সংস্থান, তার খনিগুলি, তার কলকব্জা—এই সকলই কি ইংল্যাণ্ডের এই আশ্চর্য্য ঐহিক উন্নতির মূলে? খনিকে খুঁড়িল কে? কলকব্জা কি "আকাশ হইতে ঝুপ্ করিয়া পড়িল"? তার জাহাজগুলির "অমল ধবল পালে" কি কেবল "মন্দ মধুর হাওয়া"

লাগিয়াই দিকে দিকে তারা বলাকার মত ছুটিয়া সপ্তসাগর ছাইয়া গেল ?

কিপ্‌লিঙের পিতামহ ওআর্ড্‌সোআর্থ্‌, তাঁর পিতামহ মিল্‌টন্‌।

ইংল্যাণ্ড যদি অতীতে * * "Stern Duty—The daughter of the Voice of God"-কে নমস্কার করিয়া থাকে, আজও তার সমুদয় মদোদ্ধততার মধ্যে—তার সমুদয় ইম্পিরিয়ালিজমের ব্যাণ্ডের বাদ্যের মধ্যে এই সুর একেবারে চাপা পড়ে নাই। "Hold ye the Faith—the Faith our Fathers sealed us, Whoring not with visions—overwise and overstale.

Except ye pay the Lord
Single heart and single sword,
Of your children in their bondage shall He
ask them treble-tale !

Keep ye the Law—be swift in all obedience—
Clear the land of evil, drive the road and bridge
the ford.

Make ye sure to each his own
That he reap where he has sown ;
By the peace among Our peoples let men
know we serve the Lord !"

Body-politic-এর যে integrity—তার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিদের চারিত্রনৈতিক অবস্থা। পরকীয়া রাষ্ট্রশক্তির ঔদাসীন্য,

এমন-কি বৈরিতা-ই, কটন্‌ মিল্‌স্‌ বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বৈকল্যের কারণ হয়ত নয়।

(৫)

একথা সবাই স্বীকার করিবেন যে, এ ব্যাধির চিকিৎসার হাস্পাতাল হইতেছে ইস্কুল। ইস্কুলেই ইংরাজেরা ক্রিকেট খেলে, পরে সাম্রাজ্যের খেলা খেলিবে বলিয়া। আমরা কি, আমাদের কি হওয়া চাই, তার নির্ণয়, আর আমাদের নীতিপথের নির্দ্ধারণ, এ দুই-ই হচ্ছে একত্র জড়িত।

আজ এদেশে দিকে দিকে যত কলরব উঠিয়াছে—তা যতই পরস্পরবিরোধী হট্টগোল হোক্‌—"হাটের মাঝে বাটের মাঝে" সকল কোলাহলের অন্তরে এই মূল একটি তানকে—তা সে যতই ভাঙা আর যতই মোটা হোক্‌, ধরিতে পারা যাইবে—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।"

সেই জীবনকে বিভিন্ন প্রকৃতির মনীষা বিভিন্ন চিত্ত বিচিত্র করিয়া আপনাদের বুদ্ধির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাই এত তর্ক। যাঁদের বুলি পরস্পরের ঠিক উল্টা, তাঁদের চোখের সংস্কারের ঠুলি খুলিলেই তাঁরা দেখিতে পাইতেন, যার জন্য এত আকুলি-বিকুলি সে পদার্থ

একই "বহুধা" বিভাতি"। বিপ্রেরা "সৎ" হইলেই তা দেখিতে পাইতেন, সত্যানুসন্ধানেও সততার প্রয়োজন আছে, যুক্তির ধারা যেখানে লইয়া যাইবে সে স্থান মনোমত না হইলেও সেই সমস্ত পথ অতিবাহন করিবার জন্য যে প্রস্তুত থাকার ভাব, তা হচ্ছে intellectual honesty এবং সততা সর্ব্বত্রই যে সব চেয়ে ভালো নীতি, সেকথা প্রবাদেও বলে।

(৬)

সেই ভারতবর্ষে ইস্কুলমাষ্টার ছিল না, ছিল গুরু। "ইস্কুলমাষ্টার" আর "ইস্কুলবয়ের" সমবেত প্রার্থনা ছিল—"সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ, মা চিদ্বিষাবহৈ।" অদৃষ্টের পরিহাস-ক্রমে আমাদেরই এখানে বর্ত্তমান সিস্টেমের সুর ইহার ঠিক উল্টা। "সহ নাববতু"—গুরু এবং ছাত্র একে অন্যকে যেন রক্ষা করি, কেবল বিদ্যাদান ও বিদ্যাগ্রহণ নয়, যে গ্রহীতা সেও উত্তমর্ণ—গুরু, শিষ্য হইতে স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ এক অপূর্ব্ব জীব নহেন, তারও সাধনা ছাত্রকে লইয়া, তাকে ছাড়িয়া তাঁর সিদ্ধি নাই, সেই কারণেই তাঁর যে মাহিয়ানা তা ছিল নিতান্তই আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে তা দেখিবার জো ছিল না। ফ্যাক্টরিতে শ্রমজীবী যে জিনিসগুলি বানায়, বৎসরের পর বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলগুলি তার ক্লান্ত হাত হইতে গড়াইয়া বস্তাবন্দী হইয়া দিগ্‌বিদিকে চলিয়া যায়। ফ্যাক্টরির শ্রমজীবীর কৃতকার্য্যতার মধ্যে আনন্দ কোথায়? ইস্কুলমাষ্টারের কৃতকার্য্যতাও যা, অকৃতকার্য্যতাও তা। কিন্তু গুরু ছিলেন একটি মহীরুহ, আর

ছাত্রগুলি তাঁর পত্রাবলী। গুরু যদি শিষ্যের জন্য হন, শিষ্যও গুরুর জন্য। শিষ্যদের জীবনের মধ্য দিয়া গুরু তাঁর জীবনরস সংগ্রহ করিতেন, বাঙলা মাসিক কাগজের দর্শনে যাকে বলে "অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ", উভয়ের মধ্যে ছিল তাই। "সহ নৌ ভুনক্তু" —গুরু এবং শিষ্য আমরা যেন একে অন্যকে ভোগ করি, পুষ্ট করি। "সহবীর্য্যং করবাবহৈ"—কেননা Virtue আর বীরত্ব একই। যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন "না" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে যে বীর্য্যের আবশ্যক হয়, গোলা-গুলির সাম্‌নে দাঁড়াইতে তার চেয়ে বেশির দরকার হয় না। "অপার আকাশের তলে" সোজা হইয়া দাঁড়ানর মতো বড় মরালিটি আর কিছু নাই, আর জীবনের যাত্রায় দুর্ব্বাদল খাদ্য থেকে মুখ ফিরাইয়া পল্লব আর ফলের জন্য আকাশের দিকে যেদিন মানুষ ঘাড় সোজা করিল, সেদিন হইতেই যে সে প্রকৃত প্রস্তাবে "মানুষ" হইল, এ খবর কে না জানে। "Vir" এই কথাটির আসল মানে হচ্ছে "মানুষ"। "Righteousness tendeth to life"—একথা বাইবেলেও আছে।

(৭)

তপোবনের মধ্যে যে "মুক্ত" জীবন ছিল, তারই এক মাত্রা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া রাজাসনের মধ্যে "দীপ্ত" হইয়াছিল। তাই হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর আদিপুরুষ যে লুথর, এ কথা কে না জানে? খৃষ্টই নব-ফ্রান্সের স্রষ্টা। "Consider the lilies of the field" যাঁর অনুরোধ, তিনিই যে "Return to Nature"-এর ধুয়ার আদি গায়ক, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

সেই লিলির রাজ্যে বনমধ্যেই মানবের আদি স্কুল। নীতিকথা যদি কদাপি মনোরম হইতে পারে, তবে তা একবার মাত্র হইয়াছে— "vineyard" থেকে যে নীতিকথা পাওয়া গেছে তাহার মধ্যে। যাঁদের "চিত্ত মেঘের মাঝখানে হারায়" তাঁদের প্রত্যেক নিশ্বাসই নৈতিক। "পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে" যে কেবল তাদের "অঙ্গ"-ই জড়ায় তা নয়, "প্রাণে"-ও ছড়ায়। গোমুখী যেমন গঙ্গাকে ক্ষণিক ধারণ করিয়া পুনরায় শত সহস্র ধারায় ছড়াইয়া দিয়াছে, তেমনি তাঁরা যে আঁধার-সুধা জল পান করেন, তাঁদের দিনের রাত্রের সমুদয় ব্যবহার এবং কাজে তারই বহির্নির্ঝর। "সবার সঙ্গে যুক্ত" হন বলিয়াই তাঁরা "মুক্ত"। তাঁরা উদ্‌ভিদকেও ভেদ করেন। সুবিপুল বিশ্ব-নৃত্যের মধ্যে নিজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার দরুণ তারই "শান্ত ছন্দ" তাঁদের "সকল কর্ম্মে"ও গিয়া সঞ্চারিত হয়। বাইরণ্ কি দুর্নীতি পরায়ণ?—"I live not in myself, but I become portion of that around me, and to me high mountains are a feeling". অপিচ "Are not the mountains, waves and skies, a part of me and of my soul, as I of them?" নীতি আইন নয়, দস্তুরও নয়, সামাজিক ভদ্রতাও নয়। নীতি বাইরে-থেকে আরোপিত শিষ্ট পোষাক নয়। নীতি যদি তাই হয় তবে তা শৃঙ্খল এবং যে বীজের মধ্যে অনন্ত প্রাণের বেগ কারারুদ্ধ রহিয়াছে, সে যদি বহু শতাব্দীর বড় সাধের কারুকার্য্য-ময় ঐতিহাসিক প্রাসাদটিকে—যার আশ্রয়ের মধ্যে নিরাপদে শিষ্টতা, সভ্যতা ও সম্মান এবং ধার্ম্মিকতা বজায় থাকিতেছে, তাকে গভীর তলদেশ হইতে নিদারুণ ফাটল ধরাইয়া দিয়া তার অন্তঃসার-

হীনতাকে, জীর্ণতাকে প্রতিদিন নিষ্ঠুর বাস্তব-রূপে সুগোচর এবং স্পষ্টতর করিয়া তোলে, তবে তাকে গাল দিলে ঝাল মেটে বটে, কিন্তু নীতি এবং দুর্নীতির ভেদরেখাও ধরা পড়ে না, নীতিরও সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। নীতি কি নিয়ম? উচ্ছল ঝরণার নিয়ম কে আবিষ্কার করিবে? যে প্রাণ তার দুর্নিবার বেগে প্রতিমুহূর্ত্তে শত ফেনায়, লক্ষ বুদ্‌বুদে, সহস্র ঘূর্ণিপাকে আছড়াইয়া মারিতেছে, তার বেদনার তাপকে মাপিবার যন্ত্র কি নীতির থার্ম্মোমেটার? নীতিবাদী সমা-লোচকের জ্ঞাতি ভাই সজারু। সজারু তার কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া ফলের গাছের তলে গড়াগড়ি দেয় যে ফলগুলি তার কাঁটায় বেঁধে, সেগুলি লইয়া সে দেয় এক দৌড়। ঘটনাকে আবহমান জীবন-থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, তার মানে কোথায়? বুদ্‌বুদকে হাতের মুঠার মধ্যে কে ধরিতে পারে? সকলেরই নিজ নিজ পছন্দ আছে—প্রেমিক পছন্দ করে গণ্ডের রক্তরাগকে।

"............the dilating soul, enrapt, transfused,
Into the mighty vision passing—there
As in her natural shape, swelled vast to Heaven"—

Mont Blanc দেখিয়া Coleridge-এর এই যে ভাব, ইহাই না তার Ancient Mariner-এর মৈত্রী-ভাবনার জনক? আসলে, "মানস-ভ্রমণ" মনের, আর "মাতা যথা নিজং পুত্তং" তদ্রূপ যে "ভাবনা" তা আত্মার, আর "righteousness" ইহার ব্যায়াম। Benevolence-ই justice হইয়া দেখা দিতেছে কর্ম্মে। যে বুদ্ধি "হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, ঠিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, আলোকে

পুলকে সমস্ত ভূলোকে প্রবাহিয়া” চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, সে-ই কর্ম্মক্ষেত্রে বলিতেছে “সমুদয় আপনারে দিই একেবারে জগতের পায়ে বিসর্জ্জন”। হুইট্‌ম্যান্ তাঁর চার-পায়ার উপর বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, দূরে দুরান্তরে কোথায় অখলা অবলা তরুণীরা প্রতারিত হইতেছে, কোথায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে জুয়া খেলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইতেছে, নাবিকদের মধ্যে কা'কে সর্ব্বাগ্রে নিজের মাংস দিয়া সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, কোথায় কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ, আদিম-অধিবাসীদের শীকার করিতে বাহির হইয়াছে, বর্ব্বর গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িল, কোনো কোনো কাজ করিবার পরে তরুণ-বয়স্কদের যে মর্ম্মদাহী গুপ্ত কান্না দেশে দেশে নগরে নগরে গুমরিয়া মরিতেছে, তা তিনি বসিয়া বসিয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন। এই যে “দিগ্বিদিকে আপনারে......... বিস্তারিয়া” দেওয়া ইহাই যোগ। নীতি হচ্ছে জীবনের গতির ভঙ্গী, ড্রিল নয়। গুরু জীবনের গতিভঙ্গীর অনুসরণ করিতেন, ইস্কুলমাষ্টার জীবনকে ব্যবস্থা দেন।

প্রকৃতি এবং মানবের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলা, ইহাই নির্ব্বাণ। এইখানেই “die to live”-এর paradox. নির্ব্বাণ আর মুক্তির মধ্যে তফাৎই এই যে, নির্ব্বাণ কেবলমাত্র নিজেকে হারায়, মুক্তি নিজেকে হারাইয়া আবার ফিরিয়া পায় নব সম্বন্ধের মধ্যে—মুক্তি-দেবতা দ্বি-আনন দেবতা—তার এক মুখ মুক্তি, আর এক মুখ বন্ধ; তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি সেখানে একই দণ্ডের দুই প্রান্ত। মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্ম্মের ক্ষেত্রে বিচিত্ররূপে প্রকাশ। প্রকৃতির সাধনার মধ্যে নীতির কোনো প্রশ্ন নাই, কাব্যরাজ্যে নীতির প্রবেশ নিষেধ; কর্ম্মক্ষেত্রই

নীতির ক্ষেত্র। অথচ পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বড় নীতিসাধক জাতি যে য়ীহুদী জাতি, তার মুকুটমণি যে যীশু, তাঁর মতো কবিও ত দেখিতে পাই না। ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবের পাপপুঞ্জকে আপনার মধ্যে অনুভব করিবার যে কল্পনা, সে কল্পনা নিশ্চয়ই “মানস-ভ্রমণের” কল্পনা। আসলে কল্পনাই কর্ম্মের জননী। তাই যিনি “কবি” এবং “মনীষী”, তিনিই “শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ”, যুগ যুগ গ্রহ-তারাগণের এবং জীবপুঞ্জের প্রয়োজনসকল “যাথাতথ্যেন” ঠিক-ঠিক-রূপে বিধান করিতে পারিয়াছেন; মাতা যে-প্রকার বিদেশগামী পুত্রের সকল বন্দোবস্ত ঠিক-ঠাক করিয়া দেন। প্রেমই মানুষকেও কবি করে এবং মাতাও কবি।

ইস্কুলমাষ্টার।

ভারতবর্ষ সভ্য কিনা ?

——:o:——

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল মীমাংসার যুগ, একালে হয়েছে সমস্যার। কথা যে সত্য, এতগুলো কমিসনই তার প্রমাণ। এই আজকের দিনে পাঁচ পাঁচটা কমিসনের প্রসাদে পাঁচ পাঁচটা সমস্যা রাজ-দরবারে টাঙানো রয়েছে ; যথা—(১) চাকরীর সমস্যা (২) স্বরাজের সমস্যা (৩) অরাজকতার সমস্যা (৪) শিল্পের সমস্যা (৫) শিক্ষার সমস্যা ; তার উপর আবার এসে জুটেছে বিয়ের সমস্যা।

এর পর জন্ম মৃত্যু বাদে দুনিয়ার আর কোন্ সমস্যা বাকী রইল ? ও-দুটির যে কোনও সমস্যা নেই, তার কারণ ও-দু'টিই হচ্ছে রহস্য। তবে এদেশে জন্মটা বড় রহস্য, না মৃত্যুটা বড়, এ বিষয়ে একটা তর্ক অবশ্য উঠতে পারে, কিন্তু ওঠে না এইজন্য যে, তার মীমাংসাও স্পষ্ট। আমাদের পক্ষে ও দু'-ই সমান।

এ যুগ সমস্যার যুগ বিশেষ করে' এই কারণে যে, এ যুগে অধিকারীভেদ নেই। জীবন, তা সে ব্যক্তিগতই হোক—আর জাতিগতই হোক, চিরকালই একটা সমস্যা, কিন্তু সেকালে এ সমস্যা নিয়ে মাথা বকাত শুধু দু'চারজন ; আর একালে কোনও বিষয়ে একটা সমস্যা উঠলে আমরা সকলে মিলে তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেকালে সকলের সকল বিষয়ে মত দেবার অধিকার আছে, সেকালে কোন বিষয়েই কারও চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। যদি বলো, যার নিজের একটা মত গড়বার সামর্থ্য

নেই,—এক কথায় যার মত বলে' কোনও পদার্থই নেই—সে সে-পদার্থ দান করে কি করে ?—তার উত্তর, মনের ঘরে যার শূন্য আছে, সে শূন্যই দিতে পারে, শুধু যে দিতে পারে তাই নয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তার পক্ষে তা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। একের পিছনে শূন্য বসালে তা যে দশগুণ বেড়ে যায়, এ কথা কে না জানে ? সুতরাং যার হোক একটা মতের পিছনে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে শূন্য বসিয়ে যাই, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার দশগুণ করে মূল্য বেড়ে যাবে।

সত্য কথা বলতে গেলে, রাজনৈতিকপ্রমুখ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনরূপ মত না থাকাটাই শ্রেয়। সকলেরই যদি একটা-না-একটা স্বমত থাকে, তাহ'লে নানা মতের সৃষ্টি হয় ; অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক মতশূন্য হলে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম লোকমত। আর এ কথা বলা বাহুল্য যে, একালে লোকমতই হচ্ছে একমাত্র কেজো মত, কেননা ও-মতের অভাবে হয় কোন বিলই পাস হয় না, নয় সকল বিলই পাস হয়।

এর কারণও খুঁজে বার করতে হবে না। নানা মত পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য, আর শূন্যে শূন্যে যোগ দিলে দাঁড়ায় গিয়ে বিরাট একে। এই সত্যই যে সার সত্য, তার প্রমাণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক, দু'রকম অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমান পাওয়া যাবে।

(২)

উপরে যে-সব সমস্যার ফর্দ্দ দেওয়া গেছে, তার উপর সম্প্রতি আর একটি সমস্যা এসে জুটেছে, যার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার কোনও মীমাংসা নেই—অথচ অনেক তর্ক আছে।

সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, "ভারতবর্ষ সভ্য কিনা" ? দেখতে পাচ্ছেন সমস্যাটা কত ঘোরতর, কত গুরুতর ! এ সমস্যা অবশ্য রাজনৈতিকও নয়, সামাজিকও নয়,—কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ওরই অন্তর্ভূত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন - যার মীমাংসা নেই, এমন সমস্যা ওঠে কেন ? তার উত্তর—একজনে এর পূর্ব্ব-মীমাংসা করে দিয়েছেন বলেই, আর পাঁচজনে তার উত্তর-মীমাংসা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটা বিষম তর্কে।

William Archer নামক জনৈক ধনুর্দ্ধর ইংরাজি লেখক এবং প্রবীন ভাবুক, ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করে' অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে—

"ভারতবাসীরা হচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সব চাইতে সভ্য এবং সভ্য জাতিদের মধ্যে সব চাইতে অসভ্য"। অমনি আমরা অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

এ কথায় কিন্তু বিচলিত হবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনে। William Archer-এর মত যদি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমরা যদি সভ্যতার মধ্যপথ অবলম্বন করে, থাকি, তাহ'লে ত আমরা আরিস্টটলের মতে ঠিক পথই ধরেছি, বৌদ্ধ মতেও তাই। আর সেকেলে দর্শন যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে বলি হেগেলের মতেও দাঁড়ায় এই যে, সভ্যতা (thesis) + অসভ্যতা (anti-thesis) = সভ্যাসভ্যতা (synthesis). অর্থাৎ আমাদের সভ্যাসভ্যতাটা হচ্ছে synthetic civilisation, অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেশি অসভ্য হওয়া যে ভাল নয়, সে ত পুরোনো সত্য ; আর বেশি সভ্য হওয়াও যে মারাত্মক, এই নতুন সত্য ত ইউরোপে হাতে হাতে প্রমাণ হ'য়ে গেল। এক দিকে সভ্যতা আর এক দিকে অসভ্যতা এই দুই চাপের ভিতর পড়াটা অবশ্য সুখের অবস্থা নয় ; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে, সুখের অবস্থা, এমন কথা আর যেই বলুক, আমরা ত কখনো বলিনে।

আর এক কথা, কি সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দু'য়ের কোনটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই,—না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয় ; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে, তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতিসভ্য হ'ল তখন ভারতবাসী সভ্যতার শিকলি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, এবং একই অবস্থায় একই কারণে, গ্রীকরা হলো ফিলজফার আর রোমানরা খৃষ্টান। তারপর যখন নব রোমক-খৃষ্টান-সভ্যতা পুরোপুরি গড়ে উঠল, তখন রুসো সকলকে পরামর্শ দিলেন, আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে—অমনি দেশসুদ্ধ লোক মেতে উঠল। অপরপক্ষে যাদের জ্ঞান তারা অসভ্য, তারা যে সভ্য হবার জন্য আঁকুবাঁকু করে, তার প্রমাণ কি আর উদাহরণের অপেক্ষা রাখে ?—অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শান্তি যদি কোথায়ও থাকে ত সভ্যতা আর অসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে ; কেননা ও ক্ষেত্রে অসভ্যতা সভ্যতার, এবং সভ্যতা অসভ্যতার তেজ বিলকুল ও বেমালুম মেরে দেয়। সুতরাং একাধারে সভ্য এবং অসভ্য হওয়াটাই বুদ্ধিমান জাতের কাজ ; আর আমাদের মাথায় যে মগজ নেই, এমন কথা William Archer-ও বলেন না।

আমার এ সব কথা যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, আমার মত কেউ গ্রাহ্য করবেন না। কেননা একদল প্রমাণ করতে যেমন ব্যস্ত যে, আমরা অতি সভ্য,—আর একদল প্রমাণ করতে তেমনি ব্যস্ত যে, আমরা অতি অসভ্য। সুতরাং এ দুই দলকে কেউ ঠেকাতে পারবে না; তাঁরা তর্ক করবেনই, শুধু William Archer-এর সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গেও।

এ উভয়কেই আমি বলি স্থিরোভব। আমরা যে অসভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? আর আমরা যে সভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? কেউ যদি প্রমাণ করে' দেয় যে আমরা অসভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যা উড়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, উপরন্তু আর একটা সমস্যা বাড়বে,—সে হচ্ছে সভ্য হবার মহা সমস্যা।

অপরপক্ষে আমরা যদি প্রমাণ করে দিই যে আমরা সভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, কেননা নিজের সার্টিফিকেট নিজের কোনও কাজে লাগে না, ব্যক্তির পক্ষেও নয় জাতির পক্ষেও নয়। তা ছাড়া নিজের দরখাস্তের বলে, এক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ভাল সার্টিফিকেট আমরা কিছুতেই আদায় করতে পারব না। সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতি জাত নিজেকে "সোঽহং" মনে করে, কিন্তু অপর কোনও জাতকে "তত্ত্বমসি" বলতে প্রস্তুত নয়। তবে প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য খাটে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-সভ্যতার সুখ্যাতি যে ইউরোপের মুখে আর ধরে না, এ কথা কে না জানে? তার কারণ এই যে, যে-সভ্যতা মরে ভূত হয়ে গেছে,

উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনও বিপদ নেই; কেননা কোন জ্যান্ত সভ্যতার উপর ওসব মরা সভ্যতার কোনও দাবী নেই। প্রাচীন ও মৃত সভ্যতা কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা তার কাছ থেকে ঢের আদায় করে, এবং তার নুন খায় বলেই তার গুণ গায়। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীস-রোমের সভ্যতার মত প্রাচীন হলেও, প্রশস্য নয়—কেননা তা মৃত নয়—জীবিত। এ সভ্যতার অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তা আজও বেঁচে আছে, এবং বহুকাল বেঁচে আছে বলে আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে চায়, তাই তার দাবীর আর অন্ত নেই। এ সভ্যতার স্বপক্ষে ইউরোপের সার্টিফিকেট বার করা অসম্ভব। আর যদিই বা করা যায়, তাতেই বা কি লাভ? আমাদের জাতীয় সমস্যার আশু মীমাংসা ততটা নির্ভর করবে না—আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর যতটা নির্ভর করবে, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর।

যদি কেউ বলেন যে, ইউরোপের খাতিরে নয়—সত্যের খাতিরে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, ভারতবর্ষ সভ্য। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ও চেষ্টায় উল্টো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা বেশি। মানুষ যেমন মুখের জোরে নিজেকে অপরের চাইতে বেশি ভদ্র প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অভদ্রতারই পরিচয় দেয়, জাতিও তেমনি নিজেকে অপরের চাইতে বেশি সভ্য প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অসভ্যতারই পরিচয় দেয়। এর প্রথম কারণ সভ্যতা প্রমাণ করতে হয় হাতে কলমে, কাগজে কলমে নয়,—কেননা ও-বস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে নয়, কর্ম্মের ফলে। এর দ্বিতীয় কারণ, মানুষ সভ্য হলেও মানুষই থাকে,

সভ্য মানবেরও সত্তার মূলে রয়েছে আদিম মানব। সুতরাং মানুষ যখন অবিশ্বাসী লোকের সুমুখে নিজেকে সভ্য-মানব বলে খাড়া করতে যায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ও-ক্ষেত্রে যাকে খাড়া করা হয়, সে হচ্ছে আদিম মানব; কেননা এরকম কাজ মানুষে এক রাগের মাথায় ছাড়া আর কোন অবস্থায় করে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা থাকলে মানুষে যে এ কাজ করে না, তার কারণ ও-কাজ করা হয় অনাবশ্যক, নয় নিরর্থক। সভ্যতা বলে যদি মানব-সমাজে কোনও এক বস্তু থাকে, তাহ'লে সভ্যসমাজ মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত। যা প্রত্যক্ষ তার অস্তিত্বের প্রমাণ অনাবশ্যক। আর অসভ্যের কাছে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা কোনও প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা অসভ্যের কাছে সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে না।

মতান্তরে সভ্যতা এক বস্তু নয়, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা হরেকরকমের হয়ে থাকে; সভ্যতার ভিতরও বিশিষ্টতা আছে, এবং সভ্যতায় আর সভ্যতায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের মিলন কস্মিনকালেও হবে না। এ মতের চরমবাণী হচ্ছে—Kipling-এর এই কথা,—The East is East and the West is West, and never the twain shall meet. এ কথা দেশে বিদেশে অনেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আমার কাছে বরাবর তা নিরর্থক প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে, কেননা ও-কথার অর্থ আমি কখনও বুঝতে পারি নি। সম্প্রতি বৃটিশ-সভ্যতার একটি অগ্রগণ্য মুখপত্রে তার ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। Spectator লিখেছেন, Kipling-এর ও-কথার সাদা অর্থ হচ্ছে—Black is black and white is white.

এ ব্যাখ্যা যে অতি বিশদ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, Spectator বৃটিশ সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে, শুধু বৃটিশ অসভ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এর পর নিজের সভ্যতার বিশিষ্টতার ব্যাখ্যান করতে সকলেরই ভয় পাওয়া উচিত।

কোনও সভ্যতার বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়াতেও বিপদ আছে। ও অবস্থায় বিশিষ্টতাকেই সভ্যতা বলে মানুষের সহজে ভুল হয়। অপর সমাজের সঙ্গে নিজের সমাজ যে অংশে বিভিন্ন, সেই অংশকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে' অহঙ্কার করবার লোভ যায়। শুধু তাই নয়, তখন সেই অঙ্গকেই যেন-তেন-প্রকারেণ রক্ষা করবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে; আর তার ফলে যদি সমাজের সকল অঙ্গ পঙ্গু হ'য়ে যায়, তাতেও সমাজ তার নিজের গোঁ ছাড়েনা। উদাহরণ স্বরূপ, এই পাটেল বিলের বিপক্ষ দলের কথাই ধরা যাক না। এঁরা বলেন, জাতিভেদ প্রথা যখন হিন্দু সমাজ ছাড়া অপর কোনও সভ্যসমাজে নেই, তখন হিন্দু-সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা। অতএব হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্টতা অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথা, বজায় রাখতেই হবে, তার জন্য যদি হিন্দুজাতি ধূলাশায়ী হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এ কথা বলাও যা, আর Spectator-এর কথায় সায় দেওয়াও তাই। Spectator-এর এ মত শুধু একমাত্র বর্ণভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ওরকম ঢেরা সই দেওয়াতে, বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না ধর্ম্মজ্ঞানেরও নয়। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের গোড়ার কথা হলেও, হিন্দু-সভ্যতার শেষ কথা নাও হতে পারে।

সভ্যতার অবশ্য নানা রূপ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আছে; কিন্তু তার ক্রিয়া এক। এবং সে ক্রিয়া হচ্ছে মানব-জীবনের মুখ্য ক্রিয়া to be. এ কথায় অবশ্য তাঁরা আপত্তি করবেন, যাঁদের বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির মূল ধাতু হচ্ছে to have,—কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, জীবনে কিছু পেতে হ'লে তার আগে কিছু হ'তে হয়। এক সভ্যতার সঙ্গে আর এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য ঘটে শুধু—বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে এবং প্রতিকূলতায়। এ পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্ত্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে; তার প্রথম কারণ, একালে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির দেশের ও সেই সঙ্গে দেহের এবং মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। আর তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্ত্তমানে মানুষ বস্তুজগতের ততটা অধীন নয়, বস্তুজগত মানুষের যতটা অধীন। জাতিতে জাতিতে মনের ও ব্যবহারের পার্থক্য কমে আসছে বলে' এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, মানবজীবন বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়বে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে,—এক কথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের মানব-সভ্যতা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা। অন্তত আমাদের সভ্যতার ওজন্যে ভাবনা নেই। ভারতবর্ষ যদি একদেশ হিসেবে ধরা যায়, তাহ'লে সে দেশের সভ্যতা যুগপৎ হরবোলা ও বহুরূপী হ'তে বাধ্য।

ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা, তা নাও হতে পারে; কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে, তা যে হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। এবং প্রতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সে

কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ এ সকল সভ্যতার সামাজিক ব্যবহার এবং মনোভাবের মিলও বড় কম নয়। পণ্ডিত ব্যক্তি-দের মতে গ্রীক রোমান এবং হিন্দু-সভ্যতার ভিতর ঠিক ততখানি মিল আছে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার ভিতর যতখানি মিল আছে এবং সে মিল প্রথমত কম নয়, দ্বিতীয়ত তা ধাতুগত। যদিচ আমি পণ্ডিত নই, তবুও এ মত গ্রাহ্য করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তার কারণ আমার বিশ্বাস সকল সভ্যতারই ধাতু এক, শুধু প্রত্যয় আলাদা। সে যাই হোক, যে ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সে সব গুলিই আমার মনে হয় এক জাতীয় অর্থাৎ আমার কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক একখানি কাব্য। কাব্যে কাব্যে যে প্রভেদ থাকে, এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্ব্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট। আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা। সভ্যতার সঙ্গে কাব্যের তুলনা দেওয়ায় যদি কেউ আপত্তি করেন তাহ'লে বলি, ও-তুলনা একটা খাম-খেয়ালি ব্যাপার নয়। আমরা প্রাচীন সভ্যতার যে সব মূর্ত্তি গড়ি—হয় পূজা করবার জন্য, নয় মনের ঘর সাজাবার জন্য, অতীত শুধু তার উপাদান যোগায়, তাও আবার অতি স্বল্প মাত্রায় সেই উপাদানকে আমাদের কল্পনা শক্তি গড়ন ও রূপ দেয়—এই সেই রূপকে আমরা আমাদের হৃদয়-রাগে রঞ্জিত করি। কাব্য রচনার পদ্ধতিও ঐ।

সত্যকথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবত সব চাইতে বড় আর্ট, কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার

আর্ট, আর বাদবাকী যত কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।

এ কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এবং দার্শনিকেরা মানবেন না, কেননা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, সভ্যতা জন্মে মাটির গুণে আর দার্শনিকের বিশ্বাস ও-বস্তু পড়ে আকাশ থেকে। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যের জন্মদাতা যেমন কবি, সভ্যতার জন্মদাতাও তেমনি মানুষ। এ বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞান দর্শন কখনও আবিষ্কার করতে পারবে না, কেননা ও-হচ্ছে জীবনের একটি postulate, জ্ঞানের axiom নয় ;—অর্থাৎ মানুষের মন ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথায়ও নেই।

সে যাই হোক এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিশিষ্টতা প্রমাণ করবার কোনই প্রয়োজন নেই। William Archer প্রভৃতি সে বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ মানেন, আমাদের উপর তার রাগ এই যে, আমরা আমাদের প্রাচীনতা ত্যাগ করে নবীন হবার চেষ্টা করছি। ফলে আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীন-নবীন ওরফে সভ্যাসভ্য। East এবং West যে ভারতবর্ষে meet করেছে, এই হচ্ছে আমাদের অপরাধ; কেননা এই মিলনের ফলে কতকগুলো দুরন্ত সমস্যা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি আমরা?

পূর্ব্বাপর সভ্যতার এই মিলন ও মিশ্রন যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তার প্রমাণ ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাও ত প্রবীন-নবীন, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যার নাম দিয়েছেন antico-modern. বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা যে অংশে ও যে পরিমাণে জ্ঞানে গ্রীক, কর্ম্মে রোমান ও ভক্তিতে ইহুদি, সেই অংশে ও সেই পরিমাণে তারা সভ্য এবং বাদবাকী অংশে তারা হচ্ছে সাদা মানুষ।

যদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা antico-modern হ'তে পারে, ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা কেন যে antico-modern হ'তে পারবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটু প্রভেদ আছে। ইউরোপ তার নবীন সভ্যতার গায়ে প্রাচীন সভ্যতার কলম বসিয়েছে, অপর পক্ষে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতার গায়ে নবীন সভ্যতার কলম বসাচ্ছে। ফল কোন্‌টায় ভাল ফলবে, সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্ব্বেদীরা। তবে সহজ বুদ্ধিতে ত মনে হয় যে, নূতনের ঘাড়ে পুরাতনকে ভর করতে দেওয়ার চাইতে, নূতনকে পুরাতনের কোলেই স্থান দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

সুতরাং আমরা সভ্য কি অসভ্য সে বিষয়ে আমাদের মাথা বকাবার দরকার নেই, কেননা এখন আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য সমস্যার। প্রথমে যে ক'টি সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে তিনটি বিল আকার ধারণ করেছে তাদের সম্বন্ধেও বেশি কিছু ভাববার নেই, কেননা এ কথা নিশ্চিত যে, রাউলাট-বিল পাস হবে, প্যাটেল-বিল হবে না, এবং রিফরম-বিল পাস হবে ও হবে না। যে দু'টি বাকী থাকল, শিক্ষা ও শিল্প, সেই দু'টিই হচ্ছে এ যুগের আসল সমস্যা, কারণ এ দু'টির মীমাংসার ভার অনেকটা আমাদের হাতে এবং এ দু'টির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি, তাহ'লে আমরা সভ্য কি না, সে প্রশ্ন আর উঠবে না।

বীরবল।

নব-বসন্তে।

—:*:—

দীর্ঘ দিন ধরে বারন্দায় একলাটি আলোয় বসে চেয়ে চেয়ে আনমনে কতই দেখি। গাছের পাতা দোলে, প্রজাপতিরা হেলে দুলে চলে, ফুল মাথা নোয়ায়, আলগোছ হ'য়ে সরে দাঁড়ায়, ভঙ্গী করে' মুখখানি হেলিয়ে দেখে, আড়চোখে চায়, মুচকি হাসে, আবার বেজায় গম্ভীর হ'য়ে মাথা খাড়া করে দাঁড়ায়, রকম দেখে হেসে বলি, "সাবাস —সামান্যি মেয়ে নও তুমি"। কখনো ফুলগুলি, এ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি বলাবলি করে, ছড়িয়ে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। দুটো সাদা প্রজাপতি; ফুরে ফুরে সাদা মলমলের ডানার উপর সোণালি চুমকি বসান, ফুলবাবু দু'জন, গাঁদা ফুলের মজলিসে আসর জমাতে এসেছিল, আমলই পেলে না। সোণামুখী গাঁদা মুখ ভার করে ফিরে বসল—তার পর এলেন একটি কালো মাণিক, তার ডানার উপর রাঙা ছাপ। কালোর উপর যতটা বাহার চলে, সে তা করতে কসুর করে নি, তবে তাকে কেউ পুছলই না। তার পরে এলেন একজন কমলা রংএর, আয়তনে বৃহৎ, ডানা দুটি পুরু, যেন মখমলে গড়া, তার উপরে কালো কালো চোখের মত ছাপা আঁকা, মোটাসোটা, বড় মানুষের ছেলের মত, গজেন্দ্র গমনে! গাঁদা ফুলের মজলিসে গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসে পড়ল, যেন তার ইজারা করা

মহল, কেউ মানা করলে না। অনেক্ষণ গল্প গুজব চলল, তারপর আয়েসী বাবুর মত আস্তে সুস্থে চলে গেলেন।

আমি ভাবলাম যুই, বেলা, চামেলি থাকলে হয়ত সাদা প্রজাপতিটির আদর হ'ত, অপরাজিতা বোধ হয় কালো, লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই পরা, কাঙাল প্রজাপতিটিকে বরণ করে নিতে পারত, কিন্তু গাঁদা এদের কারোকে পছন্দ করল না। আর সে ক্ষেত্রে হয়ত কমলা রংএর পতঙ্গমটি মান পেতেন না। ফুলের রাজ্যেই অসবর্ণ প্রথা (এ অসবর্ণ, সাদায় কালোয় হলদে লালে পাটেল বিলের বিরোধী নয়।) যখন চলল না, তবে আমরা মানুষেরা তা চালাবার চেষ্টা করা বৃথা! ওরা আমাদের চেয়ে, এ সব বিষয়ে বেশী সমজদার! যে যার নয় তার সাধ্য কি যে কাছে ঘেঁষে! এই কোমল স্বভাব কমল মুখীরা সজোরে প্রচার করেন—"দরওয়াজা বন্ধ"। বাড়াবাড়ি দেখলে কাঁটার আঁচড় আর পাতার চপেটাঘাত দেওয়াও বিচিত্র নয়! তবে এ বিষয় হলফ করে কিছু বলা চলবে না, এখনো স্বচক্ষে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নি।

আমি যেন একখানা বাসর ঘরের দুয়োরের ফাঁকে আড়ি পেতে বসে আছি, চুপি চুপি বসে বসে কতই কি যে দেখছি আর মনে মনে হাসছি।

এক ঝাঁক মাটির রংএর নাক খেবড়া পাখী উড়ে এসে দেবদারু গাছের তালায় জুড়ে বসে কি খুঁটে নিয়ে খেতে লাগল। এ পাখী গুলির গায়ের কোন খানে একটুও সৌখীন রং নেই, শুধু নাকের দুধারে দুটি সোণালি টিপ, আঁচিলের মত উঁচু হয়ে আছে। সাতটি একসঙ্গে আসে যায়, ইংরাজীতে এদের নাম Seven Sisters, বাঙলায় ডাক নাম কি জানিনে। এরা সাত ভাই চম্পা নিশ্চয়ই নয়,

তিন জোড়া দম্পতি আর ঐ বাড়তি পাখীটি কে? কোন বিজোড় জীব, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা দিয়ে ফেরেন, পাছে এই চটুলের দল কিছু একটা বেয়াদবী করে বসে! ঝুপ ঝুপ করে দেবদারুর রাশি রাশি পুরাণো পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, এদের গায়ের উপর এসে পড়লেও এরা ভয় খাচ্ছে না। গাছের তলায় যা কিছুর সন্ধানে এসেছে তাই ঠোঁট দিয়ে ফুঁড়ে, পায়ের নখ দিয়ে আঁচ্‌ড়ে আঁচ্‌ড়ে একমনে আবিষ্কার করছে। পাতা ঝরার বেদনা, উত্তরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, খেদ বিলাপ, কিছুতেই আনমনা হচ্ছে না। ওদিকে আমার দুলালী হরিণীটি ঘাড়তুলে বড় বড় চোখ আরো বড় করে, এই পাতা ঝরার আওয়াজে বার বার চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। মুখের কবলিত দুর্ব্বা খসে পড়ছে, গায়ের শিরায় শিরায় কম্পন দেখা দিচ্ছে, থেকে থেকে একটি কাণ খাড়া হচ্ছে আর শুয়ে পড়ছে। "পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপ যানং!" একেবারেই শাস্ত্র সঙ্গত বিরহিণীর দুর্দ্দশা! নব-বসন্তের সমাগমে আর ভরা বর্ষায় এই অবোলাটির এমনি দশা ঘটে —আমি আজ সাত আট বৎসর ধরে বরাবর লক্ষ্য করে আসছি, এই সময়ে হতভাগীর শুয়ে, বসে, উঠে, দাঁড়িয়ে, খেয়ে, ঘুমিয়ে কিছুতেই আর সোয়াস্তি থাকে না, ঘুমের মধ্যেও শিউরে শিউরে ওঠে।

* * * *

শীত চলে যাচ্ছে—বসন্তের আগমন আকাশে বাতাসে সূচিত হয়েছে। কোকিল কেবলি ডাকাডাকি করছে; নিখিলের বুক চিরে

দেওয়া এই ডাক নীলিমার গায়ে সোণালির আভা, বনের আঁধারে ফুলের রক্তিমা বিকাশ করছে। আমাদের দেশের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, বর্ষশেষে ধরণীর নব যৌবন, বড় সুকুমার। কিশলয়ের কচি লালে, আম্র-মুকুলের মিষ্ট সুগন্ধে, শিরীষের গোলাপী আভায়, অশোকের তরুণ অরুণিমায় বড় চমৎকার। এত সুন্দর বলেই এমন আকস্মিক আর ক্ষণভঙ্গুর। এ যদি দীর্ঘ হ'ত, তাহ'লে এর আনন্দ এমন পরিপূর্ণ হ'ত না। ক্ষণিক বলেই এর স্মৃতি চিরস্থায়ী। চেতনার উপর এর আঘাত এমন প্রবল যে, অন্তরে তার সংবাদ বহুদিন ধরে সঞ্চিত থাকবে। তার পর আবার একদিন হঠাৎ কোকিলের একটু সাড়ায়, সুগন্ধের এতটুকু স্পর্শে বাতাসের ঈষৎ আন্দোলনে সমস্তটুকু সম্পূর্ণ উদ্বোধিত হয়ে উঠবে। পাতা ঝরবার বাতাস উঠেছে, দীর্ঘশ্বাস বটে, তবে শ্রান্তি ক্লান্তি তার মধ্যে নাই। যা' জীর্ণ হয়ে গেছে, যা' অযথা ভার মাত্র, তাকে মোচন করবার বর্জ্জন করবার ত্যাগ করবার, একটি সবল স্বাধীন আনন্দ সুর এই বাতাসের বুকে আছে।

* * * *

আজ শ্রীপঞ্চমী। দিনটিও বড় সুশ্রী। শেষ রাতে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল, তাই বাতাসটিও শীত-বায়ুর মতই হিম, তবে তার গতি উত্তর হতে দক্ষিণে নয়, দক্ষিণ হতেই সে উত্তরে চলেছে। সূর্য্যালোক এখনও তীক্ষ্ণ হয়নি, তার হিম কাতর মূর্চ্ছাহত ভাবটি কেটে গেছে, তাকে সজাগ বলেই বোধ হচ্ছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কুয়াশার আবছায়ার মধ্যে দিয়ে আসে নি, আকাশের পরিষ্কার পথ দিয়ে চারিদিকে

আলো ছড়াতে ছড়াতে এসেছে। আমগাছ মুকুলে ভরে গিয়েছে, বাতাস সুগন্ধে কখনো অভিভূত, কখনো বা চঞ্চল। দেবদারু এতদিন স্থির হয়েছিল, আজ ক'দিন এই বাতাসের সাড়া পেয়ে, তার জীর্ণ পাতাগুলি ঝরাতে আরম্ভ করেছে। সারাদিনই বাতাসের সঙ্গে ঝরে-পড়া, উড়ে-চলা পাতারাশের খেলা চলছে। পীতপত্রগুলি ঘুরে ঘুরে কত ভঙ্গীতেই আকাশ-পথে খেলা করে' তবে এসে মাটীর বুকে বিছানা বিছায়। দুয়ারের সম্মুখের বাদাম গাছদুটি, আজ কতদিন, পাতা সব ঝরিয়ে ফেলে, নাগা-সন্ন্যাসীর মত দাঁড়িয়েছিল, দু' তিন দিন হ'ল তাদের গায়ে, কচি পাখীর ছানার বুজে-থাকা পালকের মত পাতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এখনও রং বোঝা যাচ্ছে না, এখনও এদের নড়া-চড়ার শক্তি হয়নি, ডালগুলিকে আঁকড়ে ধরে, চুপটি করে' পড়ে আছে! এর পর যখন ক্রমে ক্রমে রংএর বাহার দেখা দেবে, পঙ্গু বাঁকা ভাব কেটে গিয়ে, দুলবার, নড়বার, কাঁপবার ক্ষমতা পাবে, তখন এদের সবুজের উপর সোণালির আমেজ, আর পাখীর পাখার মত ডানা নাড়াবার কত বিভিন্ন ভঙ্গী মনকে মুগ্ধ করবে। সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মর সঙ্গীতে বসন্তরাজের স্তুতি-গীতি গাওয়া হ'বে। আমি প্রতিদিন ভোরে বেড়াই, আর সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য।

---:*:---

গান।

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ্‌বে বলে॥
সেই আলোটি নিমেষ হত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশীষ আনি,
অমর শিখা আকুল হল মর্ত্ত্য শিখায় উঠ্‌তে জ্বলে'॥

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে' দেখ্‌বেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে। স্বর্গের কি বিপদ আশঙ্কা করচেন?

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই? সে কি কথা? তাহ'লে আমরা আছি কোথায়?

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আমাদের সংস্কারের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন্ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে ছায়া হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জান্‌তেও পারিনি।

কার্ত্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ সমস্ত অনুষ্ঠানই ত চল্‌চে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেচে। দিনশেষে সূর্য্যাস্তের সমারোহের মত, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি ত জান দেব-সেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েচে যে, সকল প্রকার বিপদের ভয় পর্য্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগ যুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্ত্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারচি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবামাত্রই যেমন বোঝা যায় স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্চে একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম কিন্তু তবু এখনো সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্ত্তিকেয়। আমার কি রকম বোধ হচ্চে বলব? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বল্লে, একবার তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখি

শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ ত জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল, সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বল্‌চেন?

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে ত আছে একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই সত্য হয়ে উঠেছিল তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বল্‌ত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে?

কার্ত্তিকেয়। আর পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এম্‌নি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে, যে সে আপনার শৌর্য্যকে আর বিশ্বাস করে না কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েচে তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারচে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কি?

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগ সাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে

করেছিলুম, ভালই হয়েচে ; ভেবেছিলুম এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন বোঝা যাচ্চে পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্ত্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আস্‌ছে, বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেচে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত কিছু থেকে স্বর্গ বহুদূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক্ আর দুর্গতিই হোক্ যাতেই চারদিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে, তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায়, তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে—লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে, নির্ব্বাপনের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেচে—সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্ত্যের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধন

মোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেচে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি—মলিনের সঙ্গে পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তাহলে আপনি কি করতে চান?

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই ত দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খসে পড়ে; তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে; আমি তেম্‌নি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়?

কার্ত্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করচে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সেত আমার ইচ্ছার উপরে নেই—যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে, সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে'—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্ত্ত্যবাসী হয়ে মর্ত্ত্যের সাধনা করতে পারব।

কার্ত্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী

সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কি উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কি আনন্দ! সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কি গৌরব! সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরীসুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে সে রাণী! তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটি রেখে আস্‌তে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান;—তাকে বেষ্টন করে ধরে যে সমুদ্র রয়েছে সেই ত স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদ-ক্রন্দনকেই ত সে মর্ত্ত্যে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্ত্তিকেয়। দেবরাজ যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্ত্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেচেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব? আমি যে বুঝতে পারচি আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে, আমি নেই বলেই ত সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করচে, ধর্ম্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর আমি নেই বলেই ত মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করচে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে আমি ত তারই উপায় করতে চলেচি—সময় হ'লেই তোমরা পরিণত ফলের মত আপন মাধুর্য্যভারে সহজেই মর্ত্ত্যে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কার্ত্তিকেয়। কখন টের পাব, মহেন্দ্র, যে আপনার সাধনা সার্থক হল?

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে? যখন জয়শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখনি বুঝব যে—

ইন্দ্র। না, দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তখনি জানবেন পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

কার্ত্তিকেয়। ততদিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধূলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই ত হ'ল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য্য সেখানে দরিদ্র বেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মান্‌তে গিয়েই ভুল হয়, যা না দেখা দেয়, তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

কার্ত্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হ'ল কেন?

বৃহস্পতি। মর্ত্ত্যে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করচে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেছি—তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এতদিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চল্লুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্ত্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেই খানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক্।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্ত্তিকেয়। বাহির কর, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির কর—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা কর।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্ত্তিকেয়। যারা স্বর্গ কামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেচে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেচ—আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিকে পাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান।

পথিক হে, পথিক হে, ঐ যে চলে, ঐ যে চলে,
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্য মনে থাকি কোণে, চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে, পায়ের ধ্বনি আকাশ তলে।
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই, তোমার চলা হৃদয় তলে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাটেল-বিল।

——:*:——

পাটেল-বিল সম্বন্ধে যে দেশব্যাপী আন্দোলন উঠেছে, তার ফলে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে-ক'টি কথা উদয় হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কার করে' লেখবার ইচ্ছা হতে এই প্রবন্ধ প্রসূত।

প্রথমেই বলে' রাখি আমি সে বিলের ধারাগুলি চোখে দেখিনি; শুধু কানে শুনে শুনে এইটুকু বুঝেছি যে, সেটি হচ্ছে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহকে আইনসিদ্ধ করবার একটি পাণ্ডুলিপি। তা'তেই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত, তখন ইংরাজ-রাজ অসবর্ণ বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলে' আইন জারি করতে উদ্যত হলে না জানি কি হ'ত! অনুজ্ঞা এবং অনুমতির প্রভেদ কি এতই সূক্ষ্ম? বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ত বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণান্তে আইনসঙ্গত করে' গেছেন, কিন্তু তার ফলে হিন্দু-সমাজে ক'টা বিধবা-বিবাহ হয়েছে?—জাতিভেদবুদ্ধি ও পূর্ব্বসংস্কার আমাদের এতই মজ্জাগত যে, বাইরের নিষেধ রহিত হলেও, ভিতরের অপ্রবৃত্তি যে শীঘ্র প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে, সে ভয়ও নেই, সে ভরসাও নেই!

তবে যে জনসাধারণে এই অনুমতির প্রস্তাবনায় এত বিচলিত হয়ে পড়েছে, তার কারণ, বিবাহসম্বন্ধই সমাজের মূলভিত্তি, তারই নিয়মে সমাজ "বিধৃতস্তিষ্ঠতি"। তাই বিবাহের প্রচলিত প্রথায় একটুও ঢিলে পড়বার কথা শুনলেই সামাজিক জীবের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে ওঠে,—কার্য্যকারণ-জ্ঞান তখন আর ততটা টন্‌টনে থাকে না।

আমার মনে হয় বিবাহসম্বন্ধকে তিন দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে

তবে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয়,—ধর্ম্মের দিক, সমাজের দিক এবং আইনের দিক। এই তিন দিক পরস্পরসম্বদ্ধ বলে'ই এ বিষয় সুস্পষ্ট আলোচনা বা ধারণা করা এত শক্ত। তার উপর একটা কবিত্বের দিক আছে, সেটা নাহয় এখন ছেড়েই দিলুম, কারণ হিন্দু-বিবাহে তাকে বড় একটা আমল দেওয়া হয় না। সেকালে স্বয়ম্বরা হত শুনেছি, কিন্তু এখন কবিত্ব বিত্তরাহুগ্রস্ত এবং রুচি শুচিবায়ুগ্রস্ত!

ইংরাজ-রাজ কেবল আইনের দিক থেকেই হিন্দু-বিবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তা' ভিন্ন আর কোন দিক থেকে তাঁরা এতে লিপ্ত হতে চানও না, পারেনও না। পাটেল-বিলের যখন বিচার হবে, তখন খুব সম্ভব দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যেদিকে ঝোঁক দেবেন, তাঁরা সেই দিকেই রায় দেবেন। কিন্তু আমাদের ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান, দেশ-কালপাত্র সবই এই সঙ্গে জড়িত; কাজেই আমরা প্রত্যেকে হয় এর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ দলে ভর্ত্তি হতে বাধ্য। এবং তা' হতে হলেই আগে উভয় পক্ষ বুঝে দেখা দরকার। যদিও দলাদলিটা প্রায় না-বোঝার দরুণই হয়ে থাকে!

প্রতিপক্ষ বলেন—এ রকম কাজে অনুমতি দেওয়াও অন্যায়। কিন্তু কাজটা ভাল কি মন্দ, সমাজের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গলজনক, সেই নিয়েই ত সমস্ত তর্ক। এবং এ তর্কের মীমাংসা জাতীয় প্রথা ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি উভয়ের সংযোগ হলে তবে সুসিদ্ধ হবে। অসবর্ণ বিবাহ সেকালের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা জানিনে। অগাধ শাস্ত্রসিন্ধুর অসংখ্য টীকাভাষ্য মন্থন করলে বোধহয় না মেলে হেন মত নেই। তবে গীতায় "বর্ণসঙ্কর"কে মানুষের দুর্দ্দশার চরম সীমা বলে যেরকম নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে, তা'তে অন্ততঃ সে

সময়ে অসবর্ণ বিবাহকে অবাঞ্ছনীয় মনে করত, এটুকু বোঝা যায়। আর সে ভাব আত্মাভিমানী জেতৃজাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, যেখানে তারা বিজিত দেশজ জাতিকে হেয় মনে করে, এবং নিজেদের আভিজাত্য রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়। শ্বেতব্রাহ্মণ ইংরাজদেরও ত এই মনোভাব; এবং শ্বেতকৃষ্ণের বর্ণসঙ্কর পৃথিবীর কোন সমাজেই সমাদৃত নয়। একদিকে দেখি গীতার এই প্রতিকূলতা, আবার ওদিকে শুনি শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের বিধি, অথচ প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ আছে। এই নানা মুনির নানা মতসঙ্কুল শাস্ত্রবিচার ছেড়ে একালে এলে দেখা যায় যে, লোকাচার অসবর্ণ বিবাহের প্রতিকূল; এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে-ভাবে বিধিবদ্ধ, অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তার মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ হিন্দুত্বের লক্ষণ আর যাই হোক, জাতিভেদ-প্রথা তার মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন কি, সে প্রথা লোপ পেলে—হিন্দুধর্ম্মের না হোক্—হিন্দুসমাজ বা হিঁদুয়ানীর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা সন্দেহ;—হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচারে অনুষ্ঠানে, মতে বিশ্বাসে জাতিভেদ এম্‌নি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যাঁরা বাহ্যিক বা আন্তরিকভাবে হিন্দু-সমাজভুক্ত থাকতে চান, তাঁরা যে প্রাণপণে হিঁদুয়ানীর এই শেষ খোঁটাটিকে ধরে' থাকতে চাবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দুর ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, তার গৌরব অগৌরব সবই ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে লিপ্ত। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সবই ত শুনি ব্রাহ্মণের জন্য; অব্রাহ্মণে কি করে না করে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। জাতিভেদ যদি সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হয় ত ব্রাহ্মণত্বও লোপ পাবে। ব্রাহ্মণের প্রায় সব বিশেষত্ব নষ্ট হয়েও যে আজও হিন্দুসমাজ টিঁকে আছে, সে কেবল এই জাতিভেদ-প্রথার গুণে বা

দোষে। সুতরাং যাঁরা সনাতন হিন্দু-সমাজরক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা যে পাটেল-বিলের বিপক্ষ হবেন, সেত ধরা কথা।

ওদিকে যাঁরা সম্পূর্ণ হিন্দু-সমাজনিরপেক্ষ, তাঁদের পাটেল-বিলের পক্ষে হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। কারণ তাঁরা Act III of 1872 অনুসারে নিজেদের "অহিন্দু" বলে' অসবর্ণ বিবাহ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন এবং করে'ও থাকেন। বরং এই কারণে একটু বিপক্ষ হতে পারেন যে, হিন্দুসমাজে থেকেই যদি অসবর্ণ বিবাহ করা যায় ত লোকের অহিন্দু হবার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে!

বাকী রইল সেই তৃতীয় দল, যাঁরা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সব আইনকানুনে আবদ্ধ থাকতে চান না, অথচ নিজেদের "অহিন্দু" বল্‌তেও আপত্তি করেন। কারণ বলা বাহুল্য যে "হিন্দু" বলতে ধর্ম্ম, সমাজ এবং জাতি, এই সবই বোঝায়; এবং যাঁরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ আংশিকভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাঁরাও ঐতিহাসিক হিন্দুজাতিভুক্ত নন বলতে নিতান্তই নারাজ। যতই স্বাধীনচেতা হও না কেন, মানুষ একলা নিজের পদযুগে মাত্র ভর করে' দাঁড়াতে পারে না; অথবা তার শরীরের পক্ষে সেই জঙ্গম খুঁটিদ্বয় যথেষ্ট নির্ভর হলেও, তার সর্ব্বভুক মনের পক্ষে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানব্যাপী কাল এবং বিশ্বব্যাপী দেশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত বোধ করা বিশেষ আবশ্যক। আমার নিজের জানতঃ দু'টি তিনটি সম্বন্ধ কেবল এই "অহিন্দু" বলবার আপত্তির দরুণ ভেঙ্গে গেছে। প্রথম যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম বিবাহ-আইন পাশ করাতে চেয়েছিলেন, তখন বাধা না দিলে অন্ততঃ ব্রাহ্মদের পক্ষে এই পথ সুগম হয়ে যেত; কিন্তু তখনো

বোধহয় সময় হয় নি। তার পরে মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসুরও এই প্রকার আইন পাশ করাবার চেষ্টা বিফল হয়েছে। দেখা যাক এবার পাটেল মহোদয়ের এবং আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। কাল পূর্ণ হলে অসাধ্যও সাধ্য হয়।

এই আইন পাশ হ'লে বলছিলুম সেই সঙ্কীর্ণ দলেরই সুবিধে হবে, যাঁরা "হিঁদু" না হয়েও হিন্দু থাকতে চান্। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধেই তাঁদের মতদ্বৈধ, আর সব বিষয়ে তাঁরা মোটামুটি একমত। যতদিন তাঁরা আচারে ব্যবহারে তাৎকালিক হিন্দুসমাজের বেশি বিরুদ্ধাচরণ না করবেন, ততদিন হিন্দুসমাজ তাঁদের বহিষ্কৃত করবার জন্য বেশি ব্যস্ত হবে না বোধহয়; কারণ হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যে না পাওয়া যায়, তা' নয়। তাই এই মতভেদ কার্য্যতঃ তত পার্থক্য ঘটায় নি; একই পরিবারের এক মেয়ের হয়ত হিন্দুমতে, আর এক মেয়ের আদিব্রাহ্ম মতে বিয়ে হয়েছে, এমন দেখা গেছে। শেষোক্ত বিবাহস্থলে শালগ্রাম সাক্ষী থাকেন না এবং হোম বাদ দেওয়া হয়, তা' ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই; তাই মিলেমিশে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। আদিসমাজ যেমন এই সাকার-নিরাকার পূজা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন, অথচ হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চেয়েছেন; পাটেল-পন্থারাও তেমনি জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেও হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চান। দুই দলের মিল এই যে, দু'জনেই হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চান; তফাৎ-এর মধ্যে দুটি ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করতে চান। এই মিলটুকুর জন্য তাঁরা

দু'জনেই সাধারণ সমাজে মিশে যেতে অক্ষম। তবে যদি জাতিভেদ প্রথার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজ সত্যসত্যই জন্মান্তরগ্রহণ করে, তাহলে আদি ও সাধারণে, পাটেল এবং অপাটেলে ক্রমশঃ কিছু প্রভেদ থাকবে কিনা, তা' অনুবীক্ষণসাপেক্ষ। দুই দলের মধ্যে আর একটি মিল এই যে, প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে তাঁরা অপ্রচলিত প্রাচীন হিন্দুত্বের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্ততঃ আদি সমাজ ত অতীতে ঠেলে গিয়ে উপনিষদ পর্য্যন্ত পৌঁচেছেন; তবে পাটেল পন্থীগণ মনুর দোহাই দিচ্ছেন কি না, ঠিক বলতে পারি নে।

দ্বন্দ্বটা কি শেষে হিন্দুজাতি এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়? আমি উচ্চৈঃস্বরে বলতে পারি যে "আমি হিন্দু"! ইংরাজ-রাজও তাঁর আইনের সীমানা পর্য্যন্ত আমার কথার সমর্থন করতে পারেন, এবং পেয়াদার বডিগার্ড দিয়ে আমার নাতির বিষয়ের অংশ পাহারা দিতে পারেন। কিন্তু তার বাইরে যে বিস্তৃত হিন্দুসমাজ পড়ে' আছে—যেখানে ইংরাজের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে আমার আত্মীয়তা, যেখানে আমার কুটুম্বিতা, যেখানে আমার "শতসহস্র মঙ্গল বন্ধন" ও সুখদুঃখ জড়িত; সেখানকার সকলে যদি আমাদের নব-দম্পতিকে আদর করে' ঘরে তুলে না নেয়, হাসিমুখে বরণ না করে,—তাহলে কি শুষ্ক বিলের খড়খড়ানিতে বিশেষ কোন সান্ত্বনা হবে?—সমাজের হিসেবে ত বল্লুম আদিসমাজ একরকম তরে' গেছে; আইন হিসেবেও বোধহয় তরে' যাবে, যদি কখনো আদালতে বিচার হয়; কারণ ইংরাজ-আদালত বিবাহ অসিদ্ধ করতে কুণ্ঠিত। তবে তার জাত-ভাই পাটেল-বিল আরও দুর্গম পথের পথিক। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, আইন হিসেবে যদিও পাটেল-বিল তরে' যায়,

তবু সামাজিক হিসেবে যতদিন না তরবে, তা'কে সম্মানসহ উত্তীর্ণ বলতে পারা যাবে না। বিবাহের ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয় হওয়া চাই, এই বিল-অনুসারে বিবাহিত অসবর্ণ দম্পতিকে হিন্দুসমাজের আপনার লোক বলে' মেনে নেওয়া চাই, তবেই এই বিল সম্পূর্ণ সার্থক হবে। অবশ্য প্রথম থেকেই সে আশা করা যায় না, এবং সমাজের ভ্রুকুটির ভয়ে আমি কাউকে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহ থেকে নিরস্ত হতেও বলিনে। বোম্বাই প্রদেশে দেখেছি বিধবা-বিবাহকারীদের একরকম মহাপুরুষ বলে' লোকে গণ্য করে, এবং সকলের সঙ্গে সেই হিসেবে আলাপ করিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম পাটেল-বিবাহিতরাও বোধহয় এদেশে স্বনামধন্য হবেন। ক্রমে ক্রমে এইরকম বিয়ে লোকের সয়ে আসবে, তার পরে হিন্দুসমাজেও গ্রাহ্য হয়ে যাবে; তখন আর তা করায় কোন বাহাদুরী থাকবে না। ইতিমধ্যে যাঁরা নাম করতে চান, তাঁরা অগ্রসর হউন;—অবশ্য আগে বিলটা পাস হয়ে যাক্!

কে না জানে যে, সমাজ গঠন ও রক্ষার জন্য নিয়ম পরমাবশ্যক, এবং নিয়ম মানেই বাধা। শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য যে-পরিমাণ নিয়ম আবশ্যক, তা' কেউ ভেঙ্গে দিতে বলছে না। বলছি শুধু "জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, আচারে বিচারে বাধা"র লৌহ-কারাগারমুক্ত করে' হিন্দু-সমাজকে সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে দিতে, তাকে পৈতৃক সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, অহল্যাপাষাণীতে প্রাণসঞ্চার করতে। কিন্তু কোথায় সে দুর্ব্বাদলশ্যাম মোক্ষদ শ্রীরাম?

কলিযুগে যে তিনি পাটেলরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাও বলিনে; এবং এই বিল পাস হলেই যে আমরা এক লম্ফে উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হব, তাও মনে করিনে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত-

লক্ষ্মীর যে শতদলপদ্মাসীনা মহিমাময়ী মূর্ত্তি কল্পনাচক্ষে দেখতে পাই, এই নব-বিবাহপদ্ধতি তার একটি দল মাত্র। কিন্তু একটি একটি করে'ই দল খুলবে, দুইটি তিনটি করে'ই ক্রমে শত পূর্ণ হবে; তাই একটির "পথ চাওয়াতেই আনন্দ"।

একটি দলে যেমন পদ্ম হয় না, তেমনি একটি লোকেও সমাজ হয় না, সেই ত মুস্কিল। একজনের মতে নতুন সমাজ গড়তে পারে বটে, যদি সে একাই একশো হয়। একে একে এমন অনেক মহাপুরুষই আমাদের পাশমুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এক একটি গ্রন্থি খুলেও দিয়ে গেছেন; তবে এখনো অনেক বাকি। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ধর্ম্মের নামে এই অসাধ্যসাধন করেছেন; কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে,তাতে ভবিষ্যৎ-চোরা সে কাহিনী আর শুনবে বলে' ভরসা হয় না। এখন দেশ কতকটা সেই স্থান অধিকার করেছে; 'বন্দে মাতরং' মন্ত্রে মরাগাঙ্গেও বান এসেছে। আগে নিজের আত্মার মুক্তির জন্য যে উৎসাহের প্রয়োগ হ'ত, তার কিয়ৎপরিমাণও দেশাত্মবোধে নিয়োজিত হলে, কালে দেশোদ্ধার হ'তে পারে। বাইরের চাপে, বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙ্গেছে, কতকপরিমাণ চৈতন্য জন্মেছে—এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটা তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না? হিন্দুসমাজ কি বুঝবে না যে, ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে; কেউ আর অধীন থাকতে চায় না, কারণ "সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও, যে এতদিন মূক ছিল সে ভাষা শিখছে, যে বধির ছিল সে শুনতে পাচ্ছে, যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখছে, যে পায়ের তলায়

পড়ে' ছিল সে উঠে বসতে চাচ্ছে; এই বেলা যদি উচ্চ জাতি পুরাতন কৃত্রিম ব্যবধান সরিয়ে ফেলে আপনি নেমে আসে ও সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যায়, সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে, অসারপদমান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ত ভাল,—তাদেরই পক্ষে ভাল; নইলে অচিরে তাদের মান ধুলোয় লুটবে, সেই সঙ্গে প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। এখনই ত তাই ঘটছে; এখনই ত হিন্দুসমাজ মৃতপ্রায়। কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরস্করণ, কেবল জাতিঃপাত ও দলাদলি করে' ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জ্জন করতে থাকলে, ক'দিন হিন্দুসমাজ টি'কবে, কা'কে নিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হবে?—সঙ্কীর্ণতা দূর করুক, কড়াক্কড় নিয়ম শিথিল করুক; কিসে হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব এবং মহত্ব তাই বিচারপূর্ব্বক রক্ষা করুক, যাতে তার ক্ষয়ক্ষতি, যা' কালের অনুপযোগী, উন্নতির বিরোধী, তাই বর্জ্জন করুক;—তবে ত জাত গেলেও জাতিরক্ষা হবে।

প্রতিপক্ষের প্রধান যুক্তির মধ্যে একটি এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেন নি, তার কারণ তাঁরা জানতেন যে, ভিন্নজাতির বিবাহ সন্তানের অবনতির কারণ, এবং এ মত আজকালকারও বিজ্ঞানসম্মত। এ বিষয় বিশেষজ্ঞই মত দিতে সমর্থ, তবে বাজে লোকের সহজ বুদ্ধিতে এই উত্তর প্রথমেই মনে আসে যে, যখন বর্ণে বর্ণে প্রকৃত প্রভেদ ছিল, তখন একথা খাটলেও খাটতে পারত। কিন্তু একালে কুলজী ছাড়া যখন অধিকাংশ লোকেরই জাতিবাচক কোন প্রমাণ বা লক্ষণ নেই বল্লেই হয়, তখন এ কৃত্রিম প্রভেদ বজায় রাখবার বৃথা চেষ্টায় কেন স্বাভাবিক ঐক্য নষ্ট করি, এবং অকারণ অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিই? বৈদ্যজাতি সঙ্কীর্ণ বর্ণ বলে'

কি কোন অংশে অপর উচ্চ জাতির চেয়ে হীন? হতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জাতিবৈষম্য বেশি প্রত্যক্ষ, কিন্তু বাঙলা দেশের সামান্য অভিজ্ঞতাই আমার সম্বল। অনেক ব্রাহ্মণ যেখানে বিদ্যাবিনয়শূন্য, অনেক ক্ষত্রিয় যেখানে বলবীর্য্যহীন, অনেক বৈশ্য যেখানে বাণিজ্যব্যবসানভিজ্ঞ, এবং অনেক শূদ্র যেখানে উচ্চতর কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়,—সে অবস্থায় আর প্রাচীন ব্যবধানকে ঠেকো দিয়ে রাখবার কি কোন আবশ্যক বা অর্থ আছে?—যেমন সগোত্র বিবাহ যেকালে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তখন হয়ত এক পরিবারভুক্ত লোকের বিবাহ নিবারণের স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু একালে এই অভাবপীড়িত অন্নচিন্তাক্লিষ্ট কন্যাদায়গ্রস্ত সমাজে কি তার মত নিরর্থক নির্ব্বোধ নিয়ম আর দুটি আছে? অথচ এই কাল্পনিক অনুচিত বাধা দূর করবার জন্য আমরা কেউ বদ্ধপরিকর হইনে। আমার ত মনে হয় অসবর্ণ বিবাহের ঢের আগে সগোত্র বিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করা উচিত। মৃত্যুর আগে কি আমরা এই সব "বাসাংসি জীর্ণানি" পরিত্যাগ করব না?

আর একটি যুক্তি এই যে, যাঁরা অসবর্ণ বিবাহ করবেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া বড় শক্ত হবে। তা ত হবেই, সে ত তাঁরা জেনে বুঝেই করবেন। যে-কোন ব্যক্তি কোন নতুন হিতকর্ম্মে অগ্রগামী হবেন, সমাজের কোন উন্নতির পথপ্রদর্শক হবেন, তাঁর কপালে ত দুঃখ আছেই। তবে অগ্রসর হন কেন?—সেই সঙ্গে মহত্বের রাজটীকা এবং বীরত্বের জয়মাল্য জড়িত আছে বলে'। পরে যারা আসবে তাদের পথ সুগম হবে বলে'। বদলের মুখে অসুবিধে, কষ্ট, এমন কি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, সবই হবে; কিন্তু তাই বলে ত চিরকাল এক জায়গায় বসে' থাকা যায় না, তা' ভাবতে গেলে ত কোনকালে চলাই

হয় না। ভাবতে শুধু হবে যে, এ পথে চলা উচিত কিনা, দেশের ও দশের পক্ষে ভাল কিনা। তারপরে কালে বিশৃঙ্খলার জায়গায় সুশৃঙ্খলা, অসুবিধার স্থানে সুবিধা আপনি প্রকাশ পাবে। নতুন ব্রাহ্মদের কি কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল?—কিন্তু এখন ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম অক্লেশে পাশাপাশি ঘর করছে।

আর একটি যুক্তি এই যে, এ বিল পাস হলে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে মনে করে' দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হবে, এবং একজন দেশীলোক এই বিলের জনয়িতা মনে করে' স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী হবে। কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ত করা হচ্ছে না। জোর করে' দেশের লোককে কিছু করতে ত বলা হচ্ছে না। শুনতে পাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আইনের মূলে একটি প্রভেদ আছে; সেটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিমদেশে আইন গড়া রাজার কার্য্যের মধ্যে গণ্য, কিন্তু পূর্ব্বদেশে আইন গড়া ছিল প্রজার কার্য্যের মধ্যে গণ্য। এখন অবশ্য সে স্বাভাবিক ক্ষমতা আমাদের গেছে। ইংরাজ-রাজ এদেশে এসে কতকগুলি বিভাগে নিজের আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন, নাহলে হয়ত শাসনতন্ত্রের ঐক্যরক্ষা দুঃসাধ্য হত। কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আইনে তাঁরা পারৎপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নি। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ যদি তাঁদের আইনে অবৈধ বলে' ধার্য্য হয়ে থাকে (কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি তাই হয়েছে) তাহলে পুনশ্চ তাঁদেরই আইন দ্বারা বৈধ করে' নেওয়া ভিন্ন উপায় কি? যিনি একবার 'না' বলেছেন, তিনিই আবার 'হাঁ' বলবেন বৈত নয়!

আমাদের সমাজের যদি নিজের অবস্থা বুঝে নিজে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্যই থাকবে, তবে আমরা ব্যবস্থাপত্রের জন্য রাজদ্বারে হাত পাততে

যাব কেন? কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের নেতা কই, ব্যবস্থাপক সভা কই? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বাভাবিক নেতা, গুরু ও চালক; কিন্তু এখন ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সভা করেন শুধু অন্ধভাবে সমাজবন্ধন কসবার জন্য, এবং অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পয়সার লোভে সবরকম ব্যবস্থাই দিতে প্রস্তুত। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের মত আমরা জন্মান্ধ নই, কিন্তু গান্ধারীর মত স্বেচ্ছান্ধ হওয়াই মনে করি পরম পুরুষার্থ। তা ছাড়া হিন্দুসমাজ এত বিপুল, জটিল ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, কোন এক দলের পক্ষে তাকে সমগ্রভাবে নড়ানোর চেষ্টা বৃথা শক্তির অপব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে যেমন এক মহা রাষ্ট্র হওয়া শক্ত, তেমনি সমগ্র হিন্দুসমাজকে একছত্রের অধীন করাও দুষ্কর; স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেই দেশ এবং সমাজকে বিভক্ত করতে হবে, তবে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র বা United States হলেই ভাল! খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের ভিতর থেকে নিজের উন্নতিচেষ্টা করাই প্রশস্ত, এবং কার্য্যতও তাই হচ্ছে বলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজ এখনো মরে নি। ব্রাহ্মসমাজের উত্থান, একই জাতের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের প্রচলন, নীচ জাতের অবমাননাবোধ ও উন্নতিচেষ্টা, বিবাহপণসম্বন্ধে আন্দোলন প্রভৃতি জীবনের লক্ষণ আশাজনক। জীবনী শক্তির প্রধান লক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকূল হবার চেষ্টাজনিত পরিবর্ত্তন। আমাদের যুবকবৃন্দই আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান আশা, বল ও ভরসা। তাঁরা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে "standing with reluctant feet"; বিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষার স্বাধীনতার মন্ত্রের রেশ এখনো তাঁদের কানে বাজছে, জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য শরীরমন ছট্‌ফট্ করছে;—কিন্তু কোন্‌দিকে যাবেন, কোন্ সাধনায় আপনার তরুণ শক্তি

নিয়োজিত করবেন? চারদিকে বাধা, চারদিকে নিষেধ, চারদিকে জীবনযৌবনক্ষয়কারী চাপ। রাজনীতির উচ্ছ্বাস রাজদ্বারে পরাহত, সমাজ-সংস্কারের উদ্যম পরিবারে প্রতিহত, শিক্ষার উৎসাহ অন্নচেষ্টায় পরাভূত, জীবনের আনন্দ অকালচিন্তায় পরাস্ত। কিন্তু এই বিঘ্ন অতিক্রম করে'ই চলতে হবে,—এই তাঁদের অদৃষ্টলিপি, এই তাঁদের সাধনা। এই চাপ সরাতে হবে, এই বাধা ঠেলতে হবে, এই নিষেধ অগ্রাহ্য করতে হবে; অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যরূপ যে দুই দৈত্য আমাদের সোণার সংসার ছারখার করে' দিচ্ছে, তাদের দেশছাড়া করতে হবে। অথচ সে কাজ করতে হবে মুখের জোরে নয়, মনের জোরে; গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে; ভিক্ষার জোরে নয়, শিক্ষার জোরে। শুধু হাত তুলে মত দেখালে চলবে না, সেই হাত কাজে লাগাতে হবে। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, সংস্কার মানে বিকার নয়, শিক্ষা মানে পাখীপড়া নয়, এ কথা তাঁদের জীবনে প্রমাণ করতে হবে, তবে ত লোকে মানবে। "মোর জীবনে তোমার পরিচয়।" ভাব ও কাজের মধ্যে সেতু-বন্ধন,—এই হোক তাঁদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য। কাজ কঠিন, তবে অসাধ্য নয়,—যদি ব্রতের মত গ্রহণ করেন, যদি বীরের মত উদ্‌যাপন করেন। তার পরে যথাকালে, শুভদিনে শুভক্ষণে যখন তাঁদের শুভবিবাহ হবে, তখন তাঁরা যেন যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ করেন, এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু সেজন্য যে তাঁর অসবর্ণিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক, এমন কোন কথা নেই।—

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।